দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 DEC 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষানীতি কি হওয়া উচিত

এম, শওকত আলী

ইন্টেলেকচুয়াল বিতর্কে না গিয়েও একথা সাধারণভাবে বলা যায় যে, শিক্ষার আপাত উদ্দেশ্য ব্যক্তি উন্নয়ন এবং পরিণামে জাতীয় উন্নয়ন। আর জাতীয় উন্নয়নের শেষ ফল সামষ্টিকভাবে জীবনযাত্রার মনের উন্নতি। এই ব্যক্তি উন্নয়ন হবে কিভাবে? শিক্ষাকে কোন উদ্দেশ্যে পরিচালির্ত করলে, শিক্ষার শেষ লক্ষ্য কি নির্ধারণ করলে, শিক্ষা নামক বৃক্ষটি আমাদেরকে কাংক্ষিত ফল দেবে? শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আসলে কি চাই- কেরানী, লাল-ফিতা প্রিয় আমলা, তথাকথিত শিক্ষিত টাউট না বেকার, সন্ত্রাসী? কি উদ্দেশ্যে শিক্ষা? সাদামাটাভাবে এর জবাব হচ্ছে শিক্ষর মাধ্যমে আমরা সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকতে চাই। এখন এই সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকা বলতে কি বোঝায় আসলে? জন্মলগ্ন থেকেই যে দেশটি প্রায় ভিক্ষার অন্নে প্রাণধারণ করছে, বিদেশী রিলিফের সরু চাল যে দেশে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজস্তরের মানুষ আপন হক বলে গণ্য করে, এমনকি সৌদী আরবের কোরবানীর গোশত যে দেশে নিঃসংকোচে কর্তাব্যক্তিদের খাবার টেবিলে স্থানলাভ করে, তলাবিহীন ঝুড়ি নামের সেই দেশটিতে 'সম্মানজনকভাবে বাঁচা' হয়ত ভিন্ন অর্থ বহন করে। তবে সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, সম্মানজনকভাবে বাঁচার অর্থ অন্যের সাহায্য না নিয়ে, পরমুখাপেক্ষী না হয়ে, চাই কি আধপেটা খেয়ে হলেও মাথা উঁচু করে বাঁচা। এভাবে বাঁচার জন্য কি দরকার? দরকার আত্মশক্তির উদ্বোধন, আত্মবিশ্বাস এবং কর্মস্পৃহা। প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের শিক্ষানীতির মধ্যে এ তিনটি বিষয় জাগানোর ব্যবস্থা কি বিদ্যমান? এ দেশীয় শিক্ষানীতির প্রণেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলা যেতে পারে যে- না, অদ্যাবধি প্রচলিত শিক্ষানীতি উপরোক্ত বিশ্বাস বা চেতনার কোনটিই জাগাতে পারেনি। বহুপূর্বেই এ সত্য উপলব্ধির সময় পার হয়েছে যে কেরানী ও বংশবদ তৈরীর লক্ষ্যে প্রণীত শিক্ষানীতি কোন আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন মর্যাদাবান জাতিগঠনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। সমাজের বর্তমান বাস্তবতা এর নির্মম সাক্ষ্য বহন করছে।

যে কোন জাতিমানস গঠনে শিক্ষাক্রম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষানীতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটে শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে। শিক্ষাকালকে যদি মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় তবে প্রথম ভাগে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাকালকে মন ও অভ্যাস গঠন, দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরকে চরিত্র, মনন ও শরীর গঠন এবং তৃতীয় অর্থাৎ কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাকালে কর্মদক্ষতা ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টিই শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবতা কি সে কথা বলে? এ দেশের অতি শৈশবকাল থেকেই সকল শিক্ষার্থীকে বুদ্ধি, মেধা, ধারণক্ষমতা ও সামর্থ্য নির্বিশেষে সকল বিষয়ে পন্ডিত তৈরী করার কাজটি চলে শিক্ষাকালের সিংহভাগ জুড়ে। যে কারণে উন্নত বিশ্বে যে বয়সে একজন শিক্ষার্থী জ্ঞানের বিশেষ শাখায় বিশেষজ্ঞ হয় সেই বয়সে এ দেশে একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠই পার হতে পারে না।

অন্যদিকে নীতি হিসেবে বলা হয়, শিশুর শিক্ষাগ্রহণ হবে আনন্দের মধ্যে। অথচ বাস্তবে শিশুর পিঠে থাকে বই-খাতাপত্রের বিশাল বোঝা আর মনে থাকে দুঃসাধ্য হোমওয়ার্কের গাঢ় ভীতি। এই অবস্থার সংগে পাঠক্রমের ব্যাপ্তি মিলিতভাবে শিক্ষার প্রতি শিশুকে করে তোলে অনাগ্রহী ও ভীতিগ্রস্ত। ভাবা যায়, একটি ৭/৮ বছরের শিশু পড়ছে বাংলা, ইংরেজী, ভূগোল, অংক, সমাজ-পরিবেশ-পরিচিতি, স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য, ধর্মীয় জ্ঞান- এত সব? এই বিশাল পাঠ্যক্রমকে সহজতর করে তোলার উপায় কি নেই? অবশ্যই, আছে। কিন্তু তার জন্য যে আন্তরিকতা ও মেধা দরকার, নেই কেবল সেটি।

শিক্ষার স্তরবিন্যাসে ও মান্ধাতা আমলের পদ্ধতি চালু রেখে প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করার আশা দুরাশাই বটে। বর্তমান পদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষার কাল পুরো দশটি বছর অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যয় পর্যন্ত। অথচ এই পর্যায়কালীন, শিক্ষা নিম্নমাধ্যমিক বা আট বছরেই সমাপ্ত হওয়া উচিত। ব্যক্তির জীবনে দু'টি বছরের গুরুত্ব না দিলেও জাতীয় জীবনে এই সময়ে মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, মেধা, গ্রহণক্ষমতা ও সামর্থ্য যাচাই ব্যতিরেকেই গড়পড়তা শিক্ষাক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে ফল কি দাঁড়াচ্ছে? যে শিক্ষার্থী বিশেষ কোন শাখায় অধিকতর ভাল করতে পারত তাকে নির্দিষ্ট সময়ের অনাবশ্যক নিগড়ে বেধে রেখে তার সময়, শক্তি ও সামর্থ্য এবং অভিভাবকের অর্থ ও আকাংক্ষার উপর অবাঞ্ছিত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর শেষ ফল জাতি ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হতেই পারে না।

এ দেশের শিক্ষানীতির অপর আর একটি আত্মঘাতি দিক হচ্ছে সবার জন্য উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটানোর হঠকারী চেষ্টা। এটা কি জন্য? জাতিকে 'উচ্চশিক্ষিত' জাতি হিসেবে পরিচিতি দান? যে দেশের এম এ/ এম এসসি পাস যুবক বিদেশে ঝাড়ুদারের চাকরির জন্য বাপ-দাদার বসতভিটা বিক্রি করে দেয় সেখানে সবার জন্য উচ্চ শিক্ষার আবদার শুধু অন্যায়ই নয়, অপরাধ। দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রতিবছর কত টাকা ভর্তুকি দিতে হয়? সে টাকা কাদের? উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকা উচিত শুধু তাদেরই জন্য, সুযোগ থাকা উচিত তাদেরই জন্য যাদের সে মেধা আছে, আসে সে যোগ্যতা। নকলবাজি করে, পরীক্ষার হলে মস্তানী করে ঘষটে ঘষটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি ডিঙ্গানোর ব্যবস্থা চালু আছে বলেই- এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনা ছাড়া আর সব কিছুই হচ্ছে। অধিকন্তু দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'প্রডাক্ট'কে দেশ ও জাতি কতটুকু কাজে লাগাতে পারছে? এক টুকরো ছাপানো সুদৃশ্য কাগজ ছাড়া তাদের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকায় সহায়তা করতে আর কি দিতে পারছে? কেন আজ এ দেশের মেধা বিদেশে পাচার হচ্ছে?

তাই এ দেশের শিক্ষানীতির আশু পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বাস্তব ও দেশমুখী চিন্তা-ভাবনার। দুঃখের বিষয়, এ দেশে বিশেষজ্ঞ বলে যারা পরিচিত তাদের অধিকাংশই ভুলে যান যে, সাইবেরিয়ার প্রচন্ড শীতে ফারকোট অত্যাবশ্যাক হলেও বাংলাদেশের তা উপযোগীও নয়, মানায়ও না। তাছাড়া যাদের জন্য তা তাঁরা পেসক্রাইব করেন তা কেনার সামর্থ্য তাদের আছে কি-না একথা ভাবার প্রয়োজনও তারা স্বীকার করেন না।

পরিশেষে বলতে হয় যে, এ দেশের মাটি ও মানুষের উপযোগী শিক্ষানীতি এ দেশের স্বাধীন অস্তিত্বের স্বার্থেই প্রণীত হওয়া অবশ্যক। এ ক্ষেত্রে অদূরদর্শী, রাজনৈতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বাস্তবতা বিমুখ শিক্ষানীতি জাতিকে আরো পরনির্ভরশীল, কর্মবিমুখ ও উচ্ছৃঙ্খল করে তুলবে। দু'দুটো স্বাধীনতা লাভের পরও কেন আমরা গরীব, কেন শিক্ষার হার বাড়ে না, কেন বিদেশী সাহায্য ছাড়া চলে না, কেন আমাদের যুব সমাজ বেকার, হতাশ, ক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত- একথা ভাবার সময় পর হয়ে যাচ্ছে।